Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 15, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.6
Pages	199-214
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

Check for updates

কবি দৌলৎ কাজির সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী। সম্পাদক ঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল। সাহিত্য প্রকাশিকা ১ম খণ্ড থেকে পুনর্মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২ গ॥

'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একখানি অতি উৎকৃষ্ট প্রণয়োপাখ্যান। হয়তো বা গোটা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। সম্পাদনার অভাবে এতকাল শিক্ষিত সাধারণ এ কাব্যরসে বঞ্চিত ছিল। সম্পাদনার সঙ্কল্প নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও একসময় (১৯৩৯-৪০ খৃঃ) সাহিত্যবিশারদের সহযোগে পুথিটি সম্পাদনা করবেন বলে চট্টগ্রামের এক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুর আগ্রহই ফলপ্রসূ হয় নি। ১৯৫৬ সনে শ্রীসতোন্দ্রনাথ ঘোষাল আলোচ্য সংস্করণটি বের করে বহুকালের একটি বড় অভাব মিটিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রিয় জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। গর্ব করবার মত এমন একখানা কাব্য এতকাল হেলায় ফেলে রাখার লজ্জা থেকে বাঙালী মুক্ত হল।

এবার কাব্য-সম্পাদনা ও কাব্যটি সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য পেশ করতে চাই।

গ্রন্থের নামটি আমাদের মনঃপূত হয় নি। কেন না 'ময়না'ই নায়িকা। কবির উদ্দিষ্ট নামও 'ময়নাবতী'। কবি স্পষ্টতই বলেছেন ঃ

'শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি। তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি।
শুনিতে লোরকরাজ ময়নার ভারতী॥ পৃঃ ৪৮ পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥ পৃঃ ৪৯

[যদিও আলাউল পদ্মাবতীর উপক্রমে 'যেহেন দৌলত কাজী চন্দ্রানী রচিল' এবং তাঁর রচিত 'সতীময়না'য় 'প্রসঙ্গ হইল লোর-চন্দ্রানীর কথা' বা 'রচিল

চন্দ্রানী-কথা অতি সুরুচির' বলে উল্লেখ করেছেন, তবু এতে গুরুত্ব না দিলেও চলে। কেন না আলাউলও কাব্যের পাঠক মাত্র।]

তাছাড়া কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ও হচ্ছে ময়নারই কৃচ্ছ্র-সাধনা ও স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঃ

শুনিতে লোরকরাজ ময়নার ভারতী ॥ পৃঃ ৪৮
সত্য বলে মহাপাত্রে বাড়িল উন্নতি।
কোন্‌মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী ॥ পৃঃ ৪৯
শ্রী আশরফ বিনোদচিত্ত রসস্থলী। ক
শুনিয়া পুছেন্ত কথা মন কুতুহলী॥
চন্দ্রানীর দেশে যদি গেল লোরপতি।
কোন্ কর্ম করিলা এথাতে ময়নাবতী॥
ময়নাবতী-রাজ্যে কি লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন্ উপায় যে করিলা চন্দ্রানী ॥ ক
কোন্‌মতে তিন মিলিল তিন সঙ্গ।[১] ক
কোন্‌মতে ময়না সঙ্গে ছাতন-প্রসঙ্গ ॥
কোন্‌মতে আছিলা বিরহে মনভঙ্গ।
কাজি দৌলতে রচে সে সবপ্রসঙ্গ ॥[২]
মনে ইচ্ছা হইল সে সব শুনিবার।
কহেন্ত দৌলৎ কাজী রচিয়া পয়ার ॥
যেন মতে মালিনীয়ে দূতীপনা কৈল।
ময়না সঙ্গে ছাতনকে মিলাইতে নারিল ॥
লোর, ময়না, চন্দ্রানী হৈল একস্থান।
সে সকল কহি শুন আশরফ খান ॥ ক পৃঃ ১১০

কাজেই, কাব্যের নামটি দ্বিখণ্ডিত না করে, কবির অভিপ্রায় অনুসারে 'সতীময়না' বা 'ময়নাবতী' নিদেনপক্ষে 'সতীময়না-লোরপ-চন্দ্রানী' রাখা বাঞ্ছনীয় ছিল। বিশেষত সাধনের কাব্যের নামও 'মৈনাসত' [ভূমিকা, পৃঃ ২]। 'লোর' রাজ্যের নাম। লোরপতি অর্থে পুথিতে 'লোরক' ও 'লোর' ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দদ্বয় কবিপ্রযুক্ত, কি লিপিকর প্রমাদে 'লোরপ'—'লোরক' ও 'লোর' হয়েছে, তা বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারসাপেক্ষ। 'লোরপতি' [পৃঃ ৯১, ৯২, ৯৮···] 'লোরনাথ' [পৃঃ ৯৫···] 'লোরেন্দ্র' [পৃঃ ৯৬···], 'লোররাজ,' 'লোররাজ্যেশ্বর,' 'লোর-রাজন',

---

১। আমার আলোচিত তিনখানা প্রতিলিপির শুধু 'গ' এ আছে।

২। কোনটাতেই নেই। একইস্থানে দুটো ভণিতা দৃষ্টে মনে হয়, পংক্তিদ্বয় প্রক্ষিপ্ত। অর্থের দিক দিয়েও পুনরাবৃত্তি মাত্র। ৭, ১০, ১২, ১৫ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

ক। সম্পাদিত সংস্করণের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ-পার্থক্য লক্ষণীয়।

'লোর-বীর', 'লোরক-কেশরী' [সম্বন্ধে 'ক'-বিভক্তি] 'লোরকরাজ', 'লোরকনৃপতি' প্রভৃতির প্রয়োগ দেখেই আমাদের মনে এ সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছে। এজন্যে

স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন ॥ নানাগুণে বিশারদ লোরক দুর্জয়। [পৃঃ ৪৯]

এ পংক্তিদুটোর 'লোরক' নামের কবি-প্রদত্ত পাঠ 'লোরপ' ছিল বলে অনুমান করা যায়। আমাদের এ অনুমান দৃঢ়মূল হয়, যখন দেখি হিন্দু নারী ময়না 'লোর' ও 'লোরক' নাম উচ্চারণ করছে [পৃঃ ১২০, ১২২···] এটি স্বামীর নাম হলে তার মুখে উচ্চারিত হত কি-না তাও বিবেচ্য। চন্দ্রানী নামটিকেই কোথাও কোথাও ছন্দের খাতিরে 'চন্দ্‌রাণী' করা হয়েছে। 'চন্দ্ররাণী' লিপিকর প্রমাদজাত। আর কবির নাম 'কাজী দৌলত' লিখলেই বিশুদ্ধ হত।

আর একটি ভুল ধারণা নিয়ে শুধু ঘোষাল মহাশয় নন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চর্চাকারী প্রায় সবাই বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। ওটারও সংশোধন দরকার। আরাকান বা রোসাঙ্গ-রাজদরবারে কোনদিন বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়নি, হয়েছে অমাত্য-সভায়। মঘরাজারা হয়তো বা প্রজা-শাসনের প্রয়োজনে বাংলা শিখতেন। কিন্তু বাংলা জানলেও তাঁরা বাংলা সাহিত্যের রস-পিপাসু ছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। চট্টগ্রাম ও আরাকান নিয়েই 'রোসাঙ্গ' রাজ্য গঠিত ছিল। কাজেই বাংলাদেশেরই এক প্রত্যন্ত অঞ্চল চট্টগ্রাম প্রায়-চিরকাল রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল।[১] অতএব, দ্বিজাতি [মঘ ও বাঙালী] অধ্যুষিত রোসাঙ্গ রাজ্যের এক অংশের লোক অর্থাৎ চট্টগ্রামবাসী রাজধানীতে স্বজাতীয় রাজকর্মচারী-পোষিত হয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মাত্র। ব্যাপারটা এ যুগে করাচী বা দিল্লীতে বসে বাঙালীর বাংলা বই লেখার মত। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা

১। গোটা চট্টগ্রাম দশম শতক থেকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ চট্টগ্রাম ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ অবধি। অবশ্য মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্যে চট্টগ্রামে ত্রিপুর এবং মুসলমান অধিকারও প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আমার সম্পাদিত 'লায়লী মজনু'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হয়। এটি বিদেশে বিজাতির উপর ইংরেজ-ফরাসীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচায়ক। এতে ইংরেজ-ফরাসীর গৌরবের কারণ আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সেরূপ নয়। সুতরাং বিদেশে বিজাতির মধ্যে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বললে বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাবের যে ধারণা মনের কোণে জেগে ওঠে, এ ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে Macaulay এবং Kipling যেমন ভারতগৌরব নন, তেমনি কাজী দৌলত বা আলাউলও রোসাঙ্গ-মণি নন। এক হিসেবে বলতে গেলে কয়েকজন ছাড়া চট্টগ্রামবাসী মধ্যযুগীয় কবিমাত্রেই রোসাঙ্গরাজ্যের কবি। আর তাঁদের মধ্যে কাজী দৌলত, মরদন, আলাউল, মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার রাজধানীর কবি। তফাৎ মাত্র এ-ই। নেপাল, ত্রিপুরা ও কামরূপরাজ্যের বাঙালী কবি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আলাউল তাই রোসাঙ্গরাজ্য বহির্ভূত অঞ্চলের বাঙালীকে 'বঙ্গদেশী' বলেছেন।[১]

আর বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান বা রোমান্স ধারার প্রবর্তক কাজী দৌলত নন, শাহ্ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ)। কাজেই বাংলাভাষায় প্রণয়োপাখ্যান বা রসসাহিত্যের উদ্ভবক্ষেত্র রোসাঙ্গের অমাত্যসভা নয়, সাধারণ ভাবে রোসাঙ্গরাজ্য।

'রোসাঙ্গ' নামটি যে 'রখখইং' থেকে নয়, রাজধানী 'ম্রোহং' থেকেই উদ্ভূত, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।[২] অবশ্য সম্পাদকও তা অনুমান করেছেন, তবে তাঁর সংশয় ঘোচেনি। [পৃঃ ৫, ৭]

সম্পাদক 'সতীময়না'র রচনাকাল মোটামুটি ১৬২২-৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমান করেছেন। আপাতত তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে। শ্রীসুধর্মার আমলের অপর কবি 'নসিবনামা'-রচয়িতা মরদন। ইনি কাজী দৌলতের পূর্ববর্তী, না সমসাময়িক, না পরবর্তী, তা নির্ণয় করা বর্তমানে দুঃসাধ্য। উভয়ের কাব্য খুঁটিয়ে বিচার করলে হয়তো কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে।

পুরুষ ভ্রমরা জাতি কি কহিব আর। জথাত পাওএ পুষ্প করএ ঝঙ্কার॥

১। পদ্মাবতী : উপক্রম।

২। আলাউল-বিরচিত 'তোহফা' : ভূমিকা, পৃঃ ৭৭-৭৮।

মরদনের এই চরণ দুটোর সঙ্গে কাজী দৌলতের

পুরুষ ভ্রমরা জাতি সম্ভ্রম না এড়ে। যেই ফুলে মধু পাএ তথা গিয়া পড়ে॥

রূপকের সাদৃশ্য আছে। এ সাদৃশ্য হয়তো একান্তই আকস্মিক। আর যদি দৌলতের প্রভাবপ্রসূত বলে অনুমান করা যায়, তবে দৌলতের কাব্য রচনাকাল ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বলে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। মরদন রোসাঙ্গ রাজ্যের [সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের] 'কাঞ্চি' পুরী বাসী ছিলেন। এখানে বসেই তিনি কাব্য রচনা করেন। তিনি স্বধর্মা রাজার স্তুতি গেয়েছেন। কিন্তু ভণিতায় সর্বত্র পীর সৈয়দ ইব্রাহীম খলিলের পদ-বন্দনা করেছেন।[১] সুতরাং তাঁর ভাগ্যে অমাত্যের অনুগ্রহ লাভ ঘটেনি।

প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনে কিংবদন্তির মূল্য কম নয়। সম্পাদক কাজী দৌলতের নিবাস সম্বন্ধীয় লোকশ্রুতিটি উপেক্ষা করেছেন। কাজী দৌলতের বাড়ী বর্তমান রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে ছিল বলে সে অঞ্চলের লোক-মুখে শোনা যায়। 'রেজওয়ান শাহ্' নামক অসমাপ্ত উপাখ্যান-রচয়িতা শমশের আলীও সুলতানপুরবাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ

খণ্ডগ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি। বঙ্গভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরা পড়ি॥

এই উক্তি থেকে মনে হয়, কাজী দৌলতের নাম ও কাব্য ঘরে ঘরে পরিচিত ছিল, তাই কবি বা কাব্যের নাম উল্লেখের প্রয়োজন বোধ হয় নি।[২] এতে অনুমান করা যায়, জনশ্রুতি মিথ্যা নয়,—কাজী দৌলতের নিবাস সুলতানপুর গ্রামেই ছিল। এই সুলতানপুরে বসে কবি ফাজিল নাসির মুহম্মদ সঙ্গীতশাস্ত্রের বই 'ধ্যানমালা' (১৭২২ খৃঃ) এবং কবি মুহম্মদ মুকিম 'গুলে বকাউলি' ও 'ফায়দুল মুকতদী' (১৭৭৩ খৃঃ) রচনা করেন।[৩]

১। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত 'পুথি পরিচিতি' (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ও মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

২। আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। পৃঃ ৭১-৭২।

৩। পুথি-পরিচিতি ও মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য।

সম্পাদক আশরফ খানের পরিচিতিও উপেক্ষা করেছেন। চট্টগ্রামের হাট-হাজারী থানার 'চারিয়া' গ্রামে লস্কর উজীর আশরফ খানের বাস্তু ও দীঘি আছে। ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ্‌র সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজেতা কদরখানের (১৩৩৯ খৃঃ) নামে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম কদলপুরেও লস্কর-উজীর আশরফ খানের দীঘি রয়েছে।

মধ্যযুগে মুসলমানের বাংলা সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদক আমাদের হতাশ করেছেন। তাঁর আলোচনায় অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার ভাব সুস্পষ্ট। শাহ্‌ মুহম্মদ সগীরের ছাপা পুথি তিনি নিশ্চয়ই দেখেন নি। গোটা বাংলাদেশে এ পুথির মাত্র তিনখানি পাণ্ডুলিপি কেবল সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহেই আছে। আর কয়েকটি পত্র রয়েছে ডক্টর এনামুল হকের কাছে। আঠারো শতক অবধি জ্ঞাত মুসলমান কবির সংখ্যা প্রায় ১৮২।[১] তিনি নাম শুনেছেন মাত্র পাঁচ-সাতজনের। এবং যাঁরা পুথি সামনে রেখে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতকে আমল না দিয়ে তিনি কবিদের মনগড়া কালক্রম নির্ধারণ করেছেন। শাহ্‌ মুহম্মদ সগীরের ভাষা-বিচারে ও কাব্যে সুলতান 'গ্যেছ' এর প্রশস্তি থেকে এখন প্রায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে কবি ১৩৮৯-১৪০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'ইউসুফ জোলেখা' রচনা করেন।[২] সৈয়দ সুলতানও ৯৯২ বা ৯৯৪ হিজরীতে তথা ১৫৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দে 'নবীবংশ' রচনা করেন। তাঁর অধ্যাত্ম-ও কাব্য-শিষ্য মুহম্মদ খান 'যুগসংবাদ বা সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' ও 'মক্তুল হোসেন' রচনা করেন যথাক্রমে ১৬৩৫ ও ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে। পীর-সাগরেদের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধানেরও বিশ্বাসযোগ্য জবাব রয়েছে।[৩] সৈয়দ সুলতান যে চক্রশালাবাসী ছিলেন তাও প্রমাণিত হয়েছে। সৈয়দ সুলতানের পৌত্র মীর মুহম্মদ সফী ও শরীফ শাহ্‌ এবং দৌহিত্র মুজাফফর কবি ছিলেন।[৪] শেখ ফয়জুল্লাহ্‌, মুহম্মদ কবীর প্রভৃতির প্রাপ্ত তারিখগুলোও ডক্টর সুকুমার সেনের অন্ধ অনুগামিতার ফলে সম্পাদক স্বীকার

১। পুথি-পরিচিতি পরিশিষ্ট 'ক'।

২। (ক) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-১৩৪২ সন। (খ) মাহেনও, আজাদী সংখ্যা ১৯৫২ খৃঃ

৩। (ক) মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। (খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১ সন।

৪। পুথি-পরিচিতি পৃঃ ৯৩, ৯৭, ১০১, ২৫১, ২৬৫।

করেন নি। ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন-গড়া মতবাদ বা theory আছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন, যেহেতু মুসলমানেরা বিদেশাগত এবং রোমান্স রচয়িতা, তাঁরা সতের শতকের পূর্বে বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। এ অমূলক theory বা পূর্বলব্ধ ধারণার বশেই মুসলমান কবির কাব্যরচনার তারিখ পাওয়া গেলেও তিনি আঠারো শতকে নামিয়ে দেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালও একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এ মনোভাবের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। বাঙালী মুসলমানের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। মুসলমান সুলতানের প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুরা বাংলাভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করলেন, আর মুসলমানেরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এরূপ মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বস্তুত, ষোল শতকেই অন্ততঃ ১৫ জন মুসলমান কবির সাক্ষাৎ পাচ্ছি। সতের শতকে পাচ্ছি ৩৪ জন এবং আঠার শতকে ১৩১ জনের মত।[১] এ তো মাত্র চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে আবিষ্কৃত কবির হিসাব। বিশাল বাংলা দেশ তো পড়েই রইল!

একথাও অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগে পাক-ভারতের হিন্দুরা সংস্কৃতেতর 'ভাষা'কে ধর্মকথা তথা লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই শুধু ব্যবহার করতেন। তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্যই সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্য-শিল্প গড়ে তোলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার গরজে গণমন আকর্ষণের জন্যে তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন মাত্র। এতে সাহিত্য-শিল্প যা গড়ে ওঠেছে, বা সাহিত্যরস যা' জমে ওঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। নতুবা সংস্কৃত সাহিত্যে দশকুমার চরিত, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, বত্রিশ সিংহাসন, পঞ্চতন্ত্র, কথা সরিৎসাগর, সুকসপ্ততি প্রভৃতি গল্প-উপাখ্যান এবং নাটক, কোষকাব্য ও মহাকাব্য থাকা সত্ত্বেও 'ভাষা'য় হিন্দুদের দ্বারা কোন রসসাহিত্য সৃষ্ট না হওয়ার আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াস ছিল না, শুধু লৌকিক দেবতার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ছিল। পাক-ভারতে মুসলমানেরাই প্রথম লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে নিছক রস-সাহিত্য

১। পুথি পরিচিতি, পরিশিষ্ট 'ক'।

বা সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি করেন। এবং এ ব্যাপারে বাঙালী মুসলমানই পথিকৃৎ বা অগ্রণী ছিলেন। শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'র পূর্ববর্তী কোন রোমান্সের সন্ধান পাক-ভারতের কোন 'ভাষা'য় আজো পাওয়া যায় নি।[১]

সম্পাদক আর একটি কথা বলেছেন। 'আদিযুগের মুসলমান কবিদিগের রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে তাঁহাদের রচনার ভাষা ছিল তৎসম শব্দ-বহুল অকৃত্রিম সাধুভাষা এবং ইহার মধ্যে আরবী ফারসী শব্দের অনাবশ্যক প্রয়োগ দেখা যায় না। এই উক্তির যাথার্থ্য সম্যক উপলব্ধি করা যায় মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় দৌলৎ কাজি ও আলাওলের রচনা আলোচনা করিলে।' [পৃঃ ২] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে হি-দুস্তানী তথা আরবী-ফারসী শব্দবহুল রচনাশৈলীর প্রচলন করেন বাংলাদেশে প্রথম রাঢ় অঞ্চলবাসী কৃষ্ণরামদাস তাঁর 'রায়মঙ্গলে'। পরে ভারতচন্দ্র এবং 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' কারগণ এ ভাষা অনুকরণ করেছেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে ফকীর গরীবুল্লাহ (১৭৬০-৮০ খৃঃ) ও সৈয়দ হামজা (১৭৮৮-১৮০৫ খৃঃ) এ রচনাশৈলী গ্রহণ করেন। এঁরাও দক্ষিণ রাঢ়-বাসী। এর পর রাঢ় অঞ্চল-বাসী বটতলার পুথি-প্রকাশকদের ফরমায়েশে অসাহিত্যিক প্রতিবেশে দোভাষী পুথিগুলো গত দেড়শ বছর ধরে রচিত হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে পুরোনো শহর মুর্শিদাবাদ ও নতুন বন্দর কলকাতার অবাঙালী সংস্কৃতি-প্রভাবিত রাঢ় অঞ্চলের বাঙালী-অবাঙালী উদ্ভূত হিন্দু-সমাজ এ রীতি ত্যাগ করে। আর পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব-মুক্ত অবাঙালী-উদ্ভূত মুসলমানেরা এ বাক্-ভঙ্গি ধরে রাখে। তফাৎ এ-ই। এর আগে বা পরে বটতলার প্রভাবমুক্ত অঞ্চলে, এক কথায় রাঢ় অঞ্চলের বাইরে হিন্দু-মুসলমানের মুখের কথায় বা সাহিত্যিক ভাষায় কোন পার্থক্য কোন কালেই ছিল না বা নেই।[২]

১। বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাউলি, ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ : সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ সন দ্রষ্টব্য।

২। (ক) দোভাষী পুথির ভাষা, দিলরুবা, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৩৬২ সন।
(খ) 'লায়লী মজনু' : ভূমিকা।

সম্পাদক মহাশয় 'বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম মুসলমান কবি হিসাবে আরাকান রাজসভার কবি দৌলৎ কাজির দাবীই সর্বাগ্রগণ্য' [পৃঃ ৪] বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা তথ্যভিত্তিক নয়। এ ব্যাপারে শাহ্ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ), শাহ্ বারিদ খান (১৫১৭-৫০ খৃঃ), দৌলত উজীর বাহ্রাম খান (১৫৪৫-৫৩ খৃঃ), সৈয়দ সুলতান (১৫৮৬ খৃঃ), মুহম্মদ কবীর (১৫৮৮ খৃঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী কবির দাবী কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

'মগ' বা 'মঘ' শব্দটি মূলত 'মগধবাসী' অর্থেই ব্যবহৃত হত। অতি প্রাচীন কালে প্রথম বৌদ্ধ (ও জৈন) মগধবাসীরাই এদেশে বৌদ্ধ (ও জৈন) ধর্মপ্রচার করতে আসেন। এই প্রথম বিদেশীর সঙ্গে বাঙালী পরিচিত হল। ফলে বৌদ্ধ ও মগধবাসী একার্থ বোধক হয়ে উঠে। চট্টগ্রামের অন্তত একটি বৌদ্ধমন্দিরকে 'মগধেশ্বরী' মন্দির (সুচক্রদণ্ডী, পটিয়া), বলা হয়। চট্টগ্রামে সাধারণ কথায়, বৌদ্ধ অর্থে 'মগ' বা 'মঘ' আর 'মগ' অর্থে বৌদ্ধ নির্দেশিত হয়। বৌদ্ধেরা আরাকানী উদ্ভূত বলেই যে এ নামে তাদের অভিহিত করা হয়, তা নয়, কেননা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার বৌদ্ধদেরও 'মগ' বলা হয় (অবশ্য কুকিদের নয়)। এমন কি চীনাদেরও চট্টগ্রামে লোকমুখে 'চীনামগ' বলতে শুনেছি। আরাকানেও মগধীরাই বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বিশেষত আরাকান রাজবংশ ও অভিজাতরা মগধের রাজবংশীয় ও ব্রাহ্মণ গোত্রীয় বলে আত্মপরিচয় দেন।[১] এতে দেখা যায়, মগধের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্টতার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এজন্যেই কাজী দৌলত রাজবংশ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি ॥ নাম শ্রীসুধর্মরাজা ধর্ম অবতার ॥ পৃঃ ৪৫।
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। অন্যত্র, মগধরাজ্যের যত যন্ত্র অনুপাম। পৃঃ ৪৭

সতের শতকের শেষার্ধের পূর্বে অর্থাৎ হার্মাদদের সঙ্গে জুটবার আগে মঘেরা জলদস্যু ছিল বলে কোন বদ্নাম নেই। এরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে পর্তুগীজদের সান্নিধ্যে এসেই। আর তারা দস্যুবৃত্তিও গ্রহণ করে হার্মাদদের

১। History of Burma : A. P. Phayre & A. G. Harvey. ও আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য।

পাল্লায় পড়ে। উচ্ছৃঙ্খল মঘ জলদস্যুর অত্যাচার যখন বাংলা দেশের সমুদ্র ও নদীর কূলাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন থেকেই 'মগ' বা 'মঘের মুলুক' অর্থান্তর লাভ করে। কাজেই সংস্কৃত 'মদগু' থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তির অনুমান কল্পনা-প্রসূত। সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক। ফারসী ব্যুৎপত্তি খোঁজাও নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে প্রচলিত বহুপ্রাচীন মঘীসন নামটিও স্মরণীয়। রোসাঙ্গের মগধবংশীয় রাজার দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল বলে অথবা মগদের 'সন' বলে একে মঘীসন বলা হয়। রোসাঙ্গ রাজের অমাত্য সভার কবি স্বয়ং আলাউল বলেছেন ঃ

"মগধের [মগ্‌দের] সন কহি শুন গুণিগণ।[১] মগ্‌দের [মগধের ?] সন সংখ্যা বুঝহ নির্ণয়। [১]
[মঘ শব্দটি 'জলদস্যু' বোধক হলে আলাউল কখনও এ শব্দ প্রয়োগ করতেন না।]

কাজেই বৌদ্ধ বলেই আরাকানীরা সাধারণত 'মঘ' বা 'মগ' নামে অভিহিত হত বলে অনুমান করাই আপাতত যুক্তি সঙ্গত।

সম্পাদক কাজী দৌলতের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দু পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। শুধু কাজী দৌলতের নয়, সব মুসলমান কবির কাব্যে তা প্রচুর পাওয়া যাবে। শাহ্‌ বারিদ খান, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান, আলাউল মুহম্মদ কবীর, মুহম্মদ খান প্রভৃতির রচনাই তার প্রমাণ। এর কারণ, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী অবিশেষের জন্যে বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে মুসলমান লেখক ভারতের Classic ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। জনসাধারণের অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের শরনাপন্ন হননি। যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে রচনা ব্যর্থ হতো। এ জন্যেই আমরা আজো পারত পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের রূপ-প্রতীক বাংলায় গ্রহণ করিনে। 'এককথায়, খৃষ্টান য়ুরোপ যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে সাহিত্যে Pagan greek ও Latin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান লেখকগণ

১। আলাউল-বিরচিত তোহ্‌ফা : সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৩৬৪ সন। পৃ : ১১০, ১২৯।

অনুরূপ কারণে অতি পরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাংলায় সাহিত্য-সৌধ গড়ে তুলেছেন। একে হিন্দুয়ানি-প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব নয়, দেশী উপাদান গ্রহণ। একই কারণে চল্‌তি প্রথার অনুসরণে শুধু কাজী দৌলত নয়, তাঁরও একশ বছর আগে দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান ব্রজবুলি ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এবং রাধাকৃষ্ণের রূপকে মুসলমান কবিরা অধ্যাত্ম সঙ্গীত রচনা করেছেন।

কাজী দৌলতের 'ময়নাবতীর বারমাস' বা 'ছাতন ময়নাবতী' বা 'রত্না ময়নাবতী'[১] মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। এটা নামে বারমাসী, ভাষায় প্রধানত ব্রজবুলি, আঙ্গিকে গীতিনাট্য, বিষয়ে প্রলোভন প্রতিরোধ প্রয়াস তথা সংযম সাধনা, এবং আকারেও দীর্ঘতম। কথোপকথনের মাধ্যমে রত্না আর ময়নার চরিত্রও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা 'বারমাসী' সাহিত্যে আর দুটো ব্যতিক্রম লক্ষণীয়, একটি মুকুন্দরামের ফুল্লরার বারমাসী, এতে সংবৎসরের দারিদ্র্য-দুঃখ বর্ণিত, অপরটি শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখার 'বারমাসী' এতে ষড়ঋতুর রূপ-বৈচিত্র্য বিধৃত। আর সব বারমাসীতে নারীর বিরহ-বিকারেরই বর্ণনা রয়েছে। তবে দৌলত উজিরের লায়লী মজনুতে মজনুর বিরহ বেদনাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'ময়নাবতী'র বারমাসীর তুলনা নেই।

সতীময়না কাব্যে চরিত্রগুলো প্রায় স্বাভাবিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। বিশেষত ময়নাবতী ও চন্দ্রানী চরিত্র নারী-স্বরূপের দুদিকের দুটো স্তম্ভ। একদিকে আদর্শবাদ, অপরদিকে জীবনবাদ। একজন আদর্শবাদের কাছে জীবনকে বলি দেয়, অপরজন জীবনোপভোগের গরজে আদর্শকে দলিত করে। আদর্শবাদ ও ভোগবাদ, সংযম ও স্বৈরাচার, সতীত্ব ও নারীত্ব, লালসা ও মর্যাদা, ত্যাগ ও ভোগ, ক্ষোভও তিতিক্ষা, লোভ ও ক্ষান্তি প্রভৃতির দ্বন্দ্বই চরিত্র দুটোতে কবি সুনিপুণ ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। মানব মনের গভীরতর বৃত্তি-প্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনে কাজী দৌলত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও সুভাষিত বুলি প্রয়োগে ও

১। পুথিতে তিন নামই পাওয়া যায়। পুথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

প্রয়োগ-বাহুল্যে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী দৌলতের জুড়ি বিরল। সতীময়না কাব্যের কাহিনীও বাস্তবতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মধ্যযুগের সাহিত্যে 'লায়লীমজনু' অতুলনীয়।

লোক-প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কাজী দৌলত আষাঢ় থেকে বৈশাখ অবধি এগার মাস রচনার পরে মারা যান। সম্পাদক জ্যৈষ্ঠমাসেরও কয়েক পংক্তি দিয়েছেন। আমরা কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণরূপ পাচ্ছি।[১] কাজী দৌলতের ভণিতাও রয়েছে। কাজেই সন্দেহ করবারও উপায় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিশারদ প্রদত্ত ক্রমিক ৪৬১ সংখ্যক পুথিতে :

মোহর হৃদত্র মনে মোর পতি বিনে
না ভাএ আনের সঙ্গ।
যবে ইহলোক না মিলে মোরক
পরলোকে হইব রঙ্গ॥

একাদশ মাস রচি দৌলত কাজী নিধন হইলেন। পরে আলাউল দ্বাদশ মাস পূর্ণ করি কহেন :

মালিনী রত্না দুতী নিজমনে ভাবি উক্তি
বহি গেল একাদশ মাস।

ক্রমিক ৫৬৭ সংখ্যক পুথি :

দৌলতে ভণতি রসলয়া ঋতু পতি
বিরহী মানসে কাম জাগে।
আশরাফ নায়কমণি কীর্তি দিগন্তর জিনি
বহতি মারুত কুসুম্ পরাগে।

একাদশ মাস রচি দৌলত কাজী নির্ধন হইলেন। পরে আলাউলে দ্বাদশ মাস পূর্ণ করি কহেন—

মালিনী রত্না দুতী নিজ মনে ভাবি অতি
বহি গেল একাদশ মাস

১। পুথিপরিচিতি, পৃ: ৫২৩, ৫২৯, ৫৩৭, ৫৪৪-৪৫।

ক্রমিক ৪৮৫ সংখ্যক পুথি ঃ

খান আশরাফ পুর মনোরথ
নব ঋতুপতি রঙ্গ
পয়ার দীর্ঘ ছন্দ।
এগারি মাস দৌলত কাজী কহি স্বর্গগত হৈল।
জ্যৈষ্ঠ মাস না পুরিল খণ্ড পোথা রৈল॥
কতদিন ব্যাজে শ্রীআলাওল কবি।
খণ্ড বাক্য পুরাইয়া পুস্তক কৈল খুবি॥

কিন্তু ৪৭৭ সংখ্যক পুথিতে ময়নার উক্তি, এবং ৪৮৬ সংখ্যক পুথিতে দেখছি জ্যৈষ্ঠ মাস পুরোপুরিই রয়েছে ঃ

মালিনী

জ্যৈষ্ঠমাস পরবেশ বারিষা আইল দেশ
তবে তুয়া কান্ত বিদেশে।
দারুণ অরুণ নিদারুণ সদৃশ
দশদিশ আনল বরিষে॥ধু[১]
কামিনী জেঠরি নিঠুর বাতাসে।
বিপরীত বাহএ বিরহী দহএ
পিউ বিনু প্রেম তরাসে॥
শুষ্কল [শুখাল] সরোবর ধীবর জলচর
বকরু মকরু মীন কুর্মে।
নিদয়া নীরসে নদএ [নদে] বন্ধ নীর
ব্যোম বাম ভেল ভূমে॥
বৃন্দাবন দল নব ঘনরুচি পল্লব
দারুণ দাব নিদাঘে।
তাপে অহোনিশি কৈছে ধনি বঞ্চসি
বিরহে দগধে বৈরাগে।
দৌলতে ভণতু দাহে নিদাঘ ঋতু
জরা যুবা বালক দেহা।
আশরফ যশ ধ্বনি ধনা ধন। সুজিনি
কল্পদ্রুম তছু ছায়া॥

১। পাঠে পার্থক্য লক্ষ্যনীয়।

ময়না

রাগ ভাটিয়ালী গীয়তে। [ক্র : ৪৭৭ রাগ সিন্ধুরা]

কিএ ভেল জেঠরি পবন মোহর বৈরী
দারুণ দাবনি দাহে।
তাতঞি ধাত্রি ছলে কো জানি কো মোল বোলে
কথঞি সুনব মুঞি তাহে ॥ ধু।
কামিনী রোষে দুঃখে বোলএ গারি
নাই [নাউ] আদেশল মুণ্ড মুড়ায়ল
ভালহি কো জানি ভেল বাটি।
খবর [খরপ<খর্পর ?] চড়ায়ল নগর ফিরায়ল
বদনে দেঅ চূণ কালি।
যো যেছে করে লোকে সো ফল সমএ ভোগে
কুটনীক দেহি সবে গালি ॥
কাজি দৌলতে গাবে সুজনে সত্য সেবে [কুটনীকে পরাভবে ক্র :৪৭৭]
দুর্জন আঁখি ঝরে বারি। [তাহা দেখি আঁখি ঝরে বারি ক্র : ৪৭৭]
শ্রীযুত আশরাফ মোহন শ্যামরূপ
শতগুণে দেব মুরারি।

ছাপা বইয়ের সাহায্যে প্রাচীন পুথির পাঠ নির্ণয় অসম্ভব। সম্পাদক সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছেন। দু'একটা পাণ্ডুলিপির সাহায্যেও কবি-প্রণীত পাঠ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিশেষত যে পুথি যত জনপ্রিয়, নানা হাতে পড়ে তার পাঠও তত বিকৃত। সতীময়নাও তেমনি একখানি পুথি। এ পুথির বিশুদ্ধ আদি-পাঠ নির্ণয়ের জন্যে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা অঞ্চলে বিভিন্ন কালে অনুলিখিত ৮।১০ খানা পাণ্ডুলিপির পরীক্ষণ, আলোচন ও সাহায্য প্রয়োজন ছিল। সম্পাদকের সে সুবিধা ছিল না, তাই তিনি 'আদর্শপাঠ' তৈরী করতে পারেন নি। অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃত অংশগুলোর সঙ্গে সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য লক্ষ্য করলে এ সত্য উপলব্ধ হবে। আমরা এখানে নমুনা স্বরূপ আরো কয়েক পংক্তির পাঠান্তর দিচ্ছি ঃ

সম্পাদিত পাঠ	পুথির পাঠ
আহা মোর পতি প্রাণের পোতলি	আহা মোর প্রাণপতি তুমি বিনে নাহি গতি.
বিনোদ লোর রাজ্যেশ্বর।	বিনোদ যে রাজ্যের ঈশ্বর।
সময় বসন্ত যৌবন কালে কান্ত	সমএ বসন্ত যুবাকালে কান্ত
এড়ি যায় দিগন্তর॥	এড়ি গেল দিগদিগন্তর।
পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর	পুরুষ ভ্রমর দহে মোর কলেবর
অন্তরে বাহিরে কালী	ভিতরেত তাহার যে কালি।
যাবৎমত্তমতি পুরি মনঃ প্রীতি	তেজিয়া যে রাজ্যপাট বিচিত্র শয্যা খাট
আর পুষ্পে করে কেলি।	নারীকাম তেজি সিংহাসন।
ত্যজি রাজ্যপাট বিচিত্র সজ্জা ঠাট	ছাড়িয়া যে আছএ ছত্র বনতরু বনপত্র
কামিনী কাম সিংহাসন।	নৃপতি এহেন কি কারণ।
ছাড়ি ছায়াছত্র রহে বন পত্র	নাহি তিল দয়ামায়া পাষাণ চরিত্র হিয়া
হেন কি করে নৃপজন।	কোনমতে শাস্ত্র হেন গণে।
নাহি দয়ামায়া পাষাণ সম হিয়া	প্রাণের কুসুধ মনে অতি অনুভব
দোষ পাইলে করে শাস্তি।	পতি সে কামসি দুরমতি।
প্রাণের বল্লভ মনের মনোভব	
পতি সে কাম-সিন্দুর [পৃঃ ৫২]	
(২)	(২)
চল চল শব্দ হৈল সৈন্য সব সাজে।	চলাচল শব্দ হৈল সৈন্য সব সাজে।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে॥	শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বহুল বাদ্য বাজে॥
মেঘের গর্জন যেন দুম্‌দুমির রোল।	মেঘের গর্জন যেন দুম্‌দুমির রোল।
সাজয় অনেক সৈন্য অপার অতুল॥	সাজিল বহুল সৈন্য সমুদ্রের তুল॥
বজ্রবাহু সারথিকে বলয় কুমার।	বজ্রবাহু সারথিক বোলিল কুমার।
রথেত সত্বর তোল অস্ত্র পরিবার॥	রথেত বান্ধিয়া তোল য়স্ত্র অনিবার॥
সাজউক বৃদ্ধ রাজা সাজে দলবল।	না সাজৌক বৃদ্ধ রাজা না সাজৌক দলবল।
মোর যুদ্ধে সহায় না হয় এ সকল॥ [পৃঃ ৮৯]	মোর যুদ্ধে সহায় না হউক সে সকল॥

পাঠই যখন আদি বিশুদ্ধতার দাবী রাখে না, তখন ভাষার ব্যাকরণ-আলোচনা নিরর্থক। তাই ভাষা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় আলোচনার উপর আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও সম্পাদক পাঠ প্রায় সর্বত্র অর্থগ্রাহ্য করে তুলেছেন। সম্পাদকের এ কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। বিশেষত আমরা জানি ঃ

গড়ন ভাঙ্গিতে পারে আছে কত খল।	ভাঙ্গন গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

সে জন্যে মুক্তকণ্ঠে সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের তারিফ করছি, তিনি অতি সামান্য উপাদানের উপর নির্ভর করে শুধু সাহিত্যের প্রতি প্রাণের টান বশত এ দুরূহ শ্রম-সাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন; এতে শিক্ষিত সাধারণের জন্যে এক উৎকৃষ্ট কাব্যলোকের দ্বার উন্মুক্ত হল। যে সব শিক্ষিতলোক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন, তাঁদের 'সতী ময়না' একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

এবার আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের একটি জ্ঞাতব্য বিষয় পেশ করব। মধ্যযুগে 'এ' এর উচ্চারণ দ্বিবিধ ছিল: একটি 'য়' অপরটি 'এ'। যথা: পত্রআর=য়, হৃদএ=য়, জাএ=য়। অপরটি এ'কার (ে)। যথা: বলএ, বুঝএ, ধরএ ইত্যাদি। অতএব 'এ' একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদান্তে এ'কার রূপে উচ্চারিত হয়। অন্যত্র সাধারণত 'য়' এবং ক্বচিৎ 'এ' উচ্চারিত হয়। 'কার' এর মধ্যে 'ই' 'ঈ' 'এ' এবং ঐকার যদিও ব্যঞ্জনবর্ণের পরে উচ্চারিত হয়, তবু লেখার সুবিধার জন্যে আমরা এ গুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণের আগেই বসাই।

এদের মধ্যে 'এ' এবং 'এ'কার নিয়েই মধ্যযুগের ভাষায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। 'এ'কার যখন 'ে' চিহ্ন হয়ে বসে, তখন কোন সমস্যা দেখা দেয় না। কেন না, এটি একালেও আছে। কিন্তু কবিরা ছন্দে 'অক্ষর' বা 'বর্ণ' সংখ্যার সমতা বিধানের জন্যে অনেকক্ষেত্রে 'এ'কারের বদলে পদান্তে গোটা বর্ণটিই বসিয়েছেন। সেকালে পদ্য সুর করে পড়া হতো, কাজেই করএ, ধরএ, বুঝএ, জানএ ইত্যাদি করে, ধরে, বুঝে, জানে রূপে একটু টেনে পড়লেই চলত। কিন্তু এ যুগে আমাদের প্রায় সবাই 'এ' কে 'য়' এ পরিণত করে করয় ধরয়, বুঝয়, জানয়, করেছেন। এ উচ্চারণ মধ্যযুগে বাঙালীর মুখে প্রচলিত ছিল কি? একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ক্রিয়াপদান্তের 'এ' কে অবিকৃত রেখে 'ে' কার রূপে উচ্চারণ করা যায় না? মধ্যযুগের আর দুটো উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়: য=অ, যথা, য়ামার, য়াপনার, য়পর ইত্যাদি। এবং হে=এ, যথা, নহে, বহে, কহে রহে, চাহে, বাহে প্রভৃতির সঙ্গে ভএ, লএ, নির্ভএ প্রভৃতির পদান্ত মিল দেওয়া হয়েছে, দেখা যায়।

আহমদ শরীফ